একদিন অকস্মাৎ

ইচ্ছে করেই আজ একটু সকাল সকাল বেরিয়েছিল ওরা। রিসেপশনে লাইন লাগার আগে গিয়ে পৌঁছতে পারলে রুগীর লিস্টে উপর দিকে নাম থাকে। ডাক্তার আসার পর হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় না, কখন নিজের নম্বর আসবে সেই আশায়। অবশ্য আগে গেলেও খানিকক্ষণ বসে থাকতে হবে। এগারোটায় ডাক্তার আসে। তার পরেও মিনিট পনেরো কুড়ি লাগে দরজার উপর আটকানো ফলকে পয়লা নম্বর পরিস্ফুট হতে। তবু, প্রথম পাঁচ-ছ'জনের মধ্যে নাম দিতে পারলে কাজলকে বাড়ির গেটে নামিয়ে দিয়ে একটার মধ্যে অফিসে পৌঁছতে পারবে অনিন্দ্য। দিনের প্রথমার্ধ অনুপস্থিত থাকবে, সে-কথা গতকাল বলে এসেছে বস্‌কে। অনিন্দ্যর বস্‌ অরিন্দম দত্ত দিলদরাজ মানুষ। তাছাড়া অনিন্দ্যর কর্মকুশলতা, সততা ও বুদ্ধিমত্তার দারুণ কদর করেন। আজকের বাজারে এই গুণগুলো যে খুব সহজলভ্য নয়, সে কথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে খুব ভালভাবে জানেন। অন্য দিন হলে তিনি নিজেই যেচে অনিন্দ্যকে পুরো দিনের ছুটি নিতে বলতেন। আজ চারটের সময় এক সাঁশালো মক্কেল আসবে। সে সময় অনিন্দ্য পাশে থাকলে স্বস্তি বোধ করবেন অরিন্দম দত্ত।

কিন্তু সকাল সকাল বেরিয়ে কিছু লাভ হল না। চৌরাস্তার মোড়ে এসে জাম-জটে ফেঁসে গেল ওরা। গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে গেছে। অথচ ট্র্যাফিক লাইটে সবুজ সঙ্কেত। খুব হৈ হট্টগোলের আওয়াজ আসছে সামনে থেকে। আগে-পিছে দায়ে-বাঁয়ের জাম-জটে আটক গাড়ির চালকদের সোচ্চার স্বগতোক্তি ও পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে জানা গেল সামনের দিকে কয়েকটা গাড়ির সওয়ারীরা নাকি রাজনৈতিক কর্মী। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থামিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে।

কাজল অবাক হয়ে বললো, "ও হরি! অ্যাদ্দিন জানতাম রাজনৈতিক দলগুলো ট্রাকে করে বিক্ষোভকারী আমদানি করে। এখানে তো মাত্তর ক'টা স্যান্ট্রো আর মারুতিই দেখছি শুধু।"

পুরোভাগের গাড়িগুলো ইতিমধ্যে দিক বদল করে এদিকপানে এগুনোর চেষ্টা করছে, চতুর্দিকে অকথ্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। মোট পাঁচখানা গাড়ি। এক একটা

গাড়িতে দু'জন তিনজন করে লোক। সবগুলোতেই লাউড-স্পীকার ফিট করা। বাঁশচেরা গলায় কানফাটানো চিৎকার করে চলেছে, "অমুক হায় হায়।" "তমুক হায় হায়।" "হায় হায়, হায় হায়।" এই অপরিসর জায়গায় ভিড়ের মধ্যে কোণঠাসা সাধারণ যাত্রীদের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠলো।

কাজল বললো, "ওরা কি সত্যি ভেবেছে এইভাবে 'হায় হায়' করে জনতার মন জয় করবে? এই যে এতগুলো গাড়ি পথের মাঝে আটকে রয়েছে, কত লোকের কত ক্ষতি হচ্ছে তাতে। এই লোকগুলো নিশ্চয়ই মনে রাখবে এসব কোন পার্টির কারসাজি এবং তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে।"

অনিন্দ্য বললো, "না গো না, রাজনীতির অন্ধি-সন্ধি বোঝা অত সহজ নয়। নুইসেন্স ভ্যালু বলে একটা জিনিস আছে না? এইসব কর্মকাণ্ড দিয়ে ওরা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করছে। ওরা চায় লোকে জানুক যে ওরা শক্তিমান, ওরা কারো তোয়াক্কা করে না। একবার যদি কোনরকমে ভোটারদের মনে ঢোকাতে পারে যে ওরাই ইলেকশনে জিতবে, অমনি ভোটাররা সুরসুর করে গিয়ে ওদের চিহ্নে ভোট দিয়ে আসবে। কারণ সবাই বিজয়ীর দলে ভিড়তে চায়। এখানে জনসাধারণের মঙ্গল অমঙ্গলের প্রশ্ন অবান্তর। ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না।"

অবশেষে হাসপাতালে পৌঁছলো যখন, এগারোটা বেজে গেছে। রিসেপশনে ভিড় নেই আর। নিজের নিজের নাম লিস্টিভুক্ত করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লাউঞ্জে বসে গেছে সবাই অনেক আগেই। কাজলের নম্বর হল বাইশ। দরজার ফলকে "চার" সংখ্যাটি জ্বল জ্বল করছে। অনিন্দ্য মোবাইলে অফিসে ফোন করে ওর অবস্থা-সঙ্কটের কথা জানিয়ে দিলো। চারটের আগে হয়তো অফিসে পৌঁছতে পারবে, তবু জানিয়ে রাখলো যদি না পেরে ওঠে।

লাউঞ্জের তিনদিকে ছোট ছোট ঘরগুলিতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা রুগী দেখায় ব্যস্ত। একপাশে বিলিং কাউন্টারের জানলা। নানারকম উপচারের খরচপত্তর জমা দেওয়ার জায়গা। সাধারণ রুগী যারা, তাদের নির্দিষ্ট ফী রিসেপশনের লম্বা কাউন্টারে জমা দিতে হয় লিস্টে নাম তোলার আগে। অন্য বড় বড় খরচগুলো এই বিলিং কাউন্টারে নেয়। লাউঞ্জের চতুর্থ দিকের পুরোটা টানা কাচের দেয়াল। কাচের দরজা বসানো মাঝে। দেয়ালের ওপাশে লম্বা করিডরটা লাউঞ্জে বসে স্পষ্ট দেখা যায়। ডাক্তার, নার্স ও হাসপাতালের কর্মীদের ব্যস্ত চলাফেরা;

রোগাক্রান্ত মানুষের আসা যাওয়া - স্ট্রেচারে, হুইল চেয়ারে, পায়ে হেঁটে।

কাজল বললো, "অনেকক্ষণ বসতে হবে, আগে জানলে একটা বই আনতাম।"

লাউঞ্জে ম্যাগাজিন বা খবরের কাগজের ব্যবস্থা নেই। পুরো হল জুড়ে সারি সারি চেয়ার। গদি আঁটা, হাতল দেওয়া চেয়ার। কিছু সোফাও আছে সারির মধ্যে। লাইন দিয়ে রুগী বসে আছে নিজের নিজের নম্বর আসার প্রতীক্ষায়।

অনিন্দ্য বললো, "তুমি করিডরে একটু হেঁটে এসো বরং। ঘণ্টা দেড়েক লেগে যাবে তোমার টার্ন আসতে।" কাজল একটু ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ালো। দরজার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে দেখলো একবার। ওর মনোগত ইচ্ছা অনিন্দ্যও চলুক। অনিন্দ্য হাত নাড়লো। কাজল দরজার বাইরে চলে গেল।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। কাচের ওপাশে করিডরে হঠাৎ মাত্রাছাড়া ব্যস্ততা দেখা গেল। একটা স্ট্রেচারে রুগী, আর তাকে ঘিরে অনেক লোক। ডাক্তার নার্স ব্যস্তভাবে সামাল দিচ্ছে। স্ট্রেচার থেমে রয়েছে একই জায়গায়। অনিন্দ্য যেখানে বসেছে সেটা কাচের দেয়াল থেকে বেশ খানিকটা দূরে, বিরাট লাউঞ্জের অন্য প্রান্তে; তবে সামনা সামনি। স্ট্রেচার থামিয়ে ডাক্তার-নার্সগুলো কি করছে বোঝা না গেলেও ব্যাপারটা যে গুরুতর সেটা আন্দাজ করতে পারে যে কেউ। নইলে রুগীকে তো বিধিমত আই.সি.ইউ, প্রাইভেট রুম, জেনারেল ওয়ার্ড কোথাও একটা নিয়ে যাওয়ার কথা এতক্ষণে। রুগীসুদ্ধু স্ট্রেচার সেখানেই একভাবে দাঁড়িয়ে আছে স্থির নিশ্চল হয়ে। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। ডাক্তার ও নার্স খুব ব্যস্তভাবে পরিচর্যা করছে, কখনো এটা কখনো ওটা দিয়ে। বসে বসে দেখছে অনিন্দ্য। কৌতূহল মেটাতে নয়, ওই দিকে মুখ করে বসে রয়েছে বলে। চেম্বারের দরজার ফলকের দিকেও দেখছে মাঝে মাঝে।

পনেরো ঢুকেছে। এবার ষোলর পালা। আরও কিছুক্ষণ কাটলো। ষোলর পর সতেরা ও আঠারো নম্বর রুগী ডাক্তার দেখিয়ে চলে গেছে। আর মাত্র তিনজনের পরেই কাজলের ডাক আসবে। আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরে পায়চারি করছে কাজল! ওর তো ফিরে আসা উচিৎ ছিল অনেক আগেই! অনিন্দ্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কাচের দরজা ঠেলে করিডরে এলো। স্ট্রেচারের রুগীকে ঘিরে ব্যস্ততা থেমে গেছে। রুগীর আপাদমস্তক এখন শাদা চাদরে ঢাকা। দু'টি ছোকরা স্ট্রেচার-বাহক অদূরে দাঁড়িয়ে আছে, বোধহয় শবদেহ মর্গে নিয়ে যাবার

নির্দেশের অপেক্ষায়। স্ট্রেচারের হাতখানেক দূরে একটি অল্প বয়সী মহিলা মাটির উপর জবুথুবু হয়ে বসে আছে।

বছর দেড়েকের একটা বাচ্চা মহিলাটির কাঁধে মাথা ঘষছে আর ক্রমাগত বলে যাচ্ছে, "ড্যাডি, ড্যাডি, ড্যাডি।"

মহিলাটির ভাবলেশহীন স্তব্ধ মুখাবয়ব দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে পরিপার্শ্বের কোন কিছুই তার চেতনাকে এই মুহূর্তে স্পর্শ করছে না। অনিন্দ্যর মনটা বিষাদে ভরে গেল।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর কাজলের দেখা মিললো। দেয়াল ও সিঁড়ির রেলিঙের মাঝখানে কোনাকুনি জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, রেলিংটাকে এক হাত দিয়ে ধরে।

"কি হয়েছে কাজল? মাথা ঘুরছে?"

কাজল মাথা নেড়ে অস্ফুট গলায় বললো, "কিছু না।"

ওরা দু'জনে লাউঞ্জে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একুশ নম্বর রুগীকে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোতে দেখা গেল। কাজলের নম্বর ফলকে উঠতেই কাজল ও অনিন্দ্য চেম্বারে ঢুকলো।

ডঃ পট্টনায়ক নামকরা ডাক্তার। খুব যত্ন নিয়ে রুগী দেখেন। প্রতি রুগীকেই যথা প্রয়োজন সময় ও মনযোগ দেন। মিনিট কুড়ি পর প্রেসক্রিপ্শন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে অনিন্দ্য ঘড়ি দেখলো। আড়াইটে বেজে গেছে। লিফ্টে করে নীচে নেমে পার্কিং প্লেস থেকে গাড়ি সংগ্রহ করলো। তারপর গাড়িটা রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে অফিসে ফোন করলো অনিন্দ্য, "স্যার, আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আজ আমি যেতে পারলাম না স্যার।"

অরিন্দম দত্ত ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না-না, আপনাকে আসতে হবে না।
আমি সান্যালকে ডেকে পাঠাবো বরং। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না।"

কাজল বললো, "তুমি অফিসে যাবে না?"

"ছোটবেলায় পেটব্যথা, কানব্যথা ও আরও কত অজুহাতে স্কুল কামাই করেছি। আজ নাহয় তোমার নাম করে একদিন ছুটি উপভোগ করবো।"

হাসপাতালে সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কাজলের মুখের ছবিটা অনিন্দ্যর চোখের সামনে থেকে থেকেই ভেসে উঠছে। কাজলকে কোনদিন ওরকম দেখেনি অনিন্দ্য এবং তার পর থেকে একেবারেই স্বাভাবিক লাগছে না তাকে।

কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে কাজল। তার মনযোগ বহু দূরে অন্য কোনখানে হারিয়ে গেছে, অনিন্দ্যের চেনা জগতের বাইরে। অনিন্দ্য এ নিয়ে কাজলকে কোন প্রশ্ন করলো না। নিজে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করলো, যদিও তার পক্ষে তা সহজ ছিল না। তার পরম আপন কাজল হঠাৎ যেন অচেনা আগন্তুক হয়ে গেছে। অফিস থেকে ফিরে প্রতিদিনের রুটিন ছকে বাঁধা। বিকেলে পার্কে হাঁটতে যায় দু'জনে। ফিরে এসে টি.ভি. খুলে বসে খানিকক্ষণ। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুম। আজ সারাটা সন্ধ্যা নীরবে কাটলো। কাজল যেন এক দুর্ভেদ্য প্রাকারের মাঝে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে এই সব কথাই ভাবছিল অনিন্দ্য। খুব ক্লান্ত লাগছিল। শারীরিক ক্লান্তি নয়, মানসিক ক্লান্তি। কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কাজল আলতো করে ওর গালে হাত রেখেছে। অনিন্দ্য কাজলের হাতখানা নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ালো।

কাজল বললো, "স্ট্রেচারের সেই রুগীকে তুমি দেখেছো?"

"না, লোকটা তখন মারা গেছে। শাদা চাদরে ঢাকা ছিল।"

কাজল বললো, "আমি দেখেছি। এ সেই শয়তানটা যার সঙ্গে সাত বছর এক ছাদের তলায় কাটিয়েছি আমি।"

অনিন্দ্য চুপ করে রইলো। কাজল বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বালালো। তারপর উঠে বসলো।

"ওর কথা শুনবে? সব কথা বলিনি তোমায়।"

"তুমি তো জানো, তোমার অতীত নিয়ে আমার মনে কোনও দ্বন্দ, কোনও ক্ষোভ নেই। কৌতূহলও নেই। তবু তোমার যদি আমাকে বলে ভাল লাগে, তবে শুনবো বৈ কি।"

কাজল ম্লান হাসলো।

"তাহলে থাক। আমারও বলতে ভাল লাগবে না। শুধু একটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগছে। ওই লোকটার প্রতি আমার কোন অনুভূতিই নেই আর। এক বিন্দুও ঘৃণা, বিদ্বেষ বা রাগ, কিচ্ছু না। ওর স্ত্রী আর বাচ্চাটার কথাই বারে বারে মনে পড়ছে আর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না এটা অস্বাভাবিক?"

"কোনটা অস্বাভাবিক?"

"ওই লোকটার প্রতি ঘৃণা না হওয়া। তার পরিবারের কথা ভেবে কষ্ট পাওয়া।"

"আমার তো মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। যে কোন বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকই অতীতের অপ্রিয় স্মৃতিগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন থেকে মুছে ফেলতে চায়। আর অন্যের দুঃখ-কষ্টে কাতর হওয়াটা তো মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

"বহুদিন আগে মার্কিন কবি মায়া অ্যাঞ্জেলু'র আত্মজীবনী পড়েছিলাম। এক দুবৃত্ত শিশুকালে ধর্ষণ করেছিল তাঁকে। সেই ছোট্ট মেয়েটি এর পর আট বছর কথা বলেনি। যেহেতু সে মুখ ফুটে নাম বলার পর লোকে সেই দুবৃত্তকে পিটিয়ে মেরে ফেলে, মেয়েটির মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে তার মুখের কথাগুলো মৃত্যুর পরোয়ানা; তার একেবারে বোবা হয়ে যাওয়া উচিৎ যাতে তাকে আর কোন মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে না হয়। ওই লোকটা যে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেছিল সে কথা ছাপিয়ে তার মৃত্যুর ঘটনাটাই প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল মেয়েটিকে। ---- আজ আর ঘুম আসবে না মনে হচ্ছে। একটু কফি খেলে হয় না?"

"এখন কফি খেলে সত্যিই আর ঘুমোতে পারবে না। তার চেয়ে বরং ফ্রিজে পুতুলমামার আনা বেলজিয়ান চকোলেট আছে নিয়ে আসছি। দাঁড়াও।"